13

দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC - 2 2000 তারিখ

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

প্রসঙ্গ শিক্ষানীতি

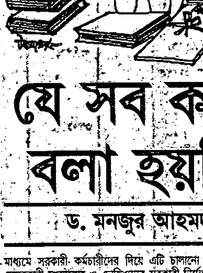

যে সব কথা বলা হয়নি

ড. মনজুর আহমদ

(শেষাংশ)

বাংলাদেশের ৮০ হাজার গ্রামে প্রায় আড়াই কোটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এবং জেলা ও থানা পর্যায়ে কিছু কর্মচারী। আরও আছে কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহ, পরিসংখ্যান সংক্রান্ত দফতর ও একটি ফ্যাসিলিটিজ বা নির্মাণ শাখা। এই ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্রাইমারী ও গণশিক্ষা সচিবের দফতর। সচিবের নেতৃত্বে সচিবালয়ের স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তার হাতেই সব ছোট-বড় সিদ্ধান্তের দায়িত্ব। যদিও শিক্ষা অধিদফতরের অভিজ্ঞ ও পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের অনেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা— সচিবালয়ের অনুমোদন বা নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু না করার রেওয়াজ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সচিবালয়ের স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তার সদুদ্দেশ্য, পরিশ্রম ও কর্মোদ্যম সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিশাল প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সচিবালয়ে কেন্দ্রীভূত রাখার ফল সম্পূর্ণ শুভ হতে পারে না। এ সম্বন্ধে প্রথম রিপোর্টে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় রিপোর্ট নীরব।

দুই রিপোর্টের কোনটিতেই যা বলা হয়নি

—প্রতি গ্রামে সব শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনার জন্য গ্রাম, থানা ও জেলাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্যোগে সরকারী, বেসরকারী, স্থানীয় সমাজ, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সম্পৃক্ততা ও অবদান রাখার সুযোগ থাকতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক ও সমাজ প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা রেখে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

—প্রতি গ্রামে ও থানায় বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী সব শিক্ষা উদ্যোগের পরিস্থিতি যাচাই করে সর্বজনীন মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী (এক থেকে দুই বছর) ও দীর্ঘমেয়াদী (পাঁচ থেকে সাত বছর) পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সকলের অবদান ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই সমন্বিত ও সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মসূচী তৈরি করতে হবে।

—প্রতি জেলার জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করে জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ক্রমশ হস্তান্তর করতে হবে। গ্রাম ও থানাভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের ও সরকারী অর্থ বরাদ্দ এদের কাছে হস্তান্তরের দায়িত্ব থাকবে জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে। জেলার সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার থোক থেকে মঞ্জুরি দেয়া হবে জেলা কর্তৃপক্ষকে। বিদ্যালয়, গ্রাম, থানা ও জেলা পর্যায়ে বেসরকারী ও বিভিন্ন রকম স্থানীয় অবদান হবে সরকারী মঞ্জুরির পরিপূরক।

কেন্দ্রীয় নির্মাণ (ফ্যাসিলিটিজ) শাখা বিলুপ্ত করে মূলধন খাতে খরচের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পরিকল্পনামাফিক বিদ্যালয়, গ্রাম, থানা ও জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে দেয়া হবে। সচিবালয়ের দায়িত্ব হবে সামগ্রিক নীতি ও জাতীয় পর্যায়ে অর্থায়নের সমন্বয়ের দায়িত্ব। শিক্ষা প্রশাসনের বর্তমান কেন্দ্রীয় অবকাঠামোকে সারা দেশের শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সহায়ক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সামগ্রিক মূল্যায়নের দায়িত্ব নিতে হবে। এ ধরনের ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। এ জন্য প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে, স্থানীয় দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তা ছাড়া দেশের সামগ্রিক প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা কিভাবে হবে এবং কতদিনে কার্যকর হবে তাও বলা যাচ্ছে না। তাই শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বল্পসংখ্যক জেলায় এই উদ্যোগ শুরু করতে হবে। প্রতি বিভাগের একটি জেলায় এই কার্যক্রম শুরু করে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার আলোকে ক্রমে এই ব্যবস্থার প্রসার হতে পারে। এখানে বলা দরকার যে, দু'টি রিপোর্টেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য ও এর পিছনে যে মনোভাব কাজ করছে তা হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত পরিকল্পনা ও নির্দেশাবলী দক্ষতার সঙ্গে স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যবস্থা করা। সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ উদ্দেশ্য নয়।

(চার)

কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ও আমলা নিয়ন্ত্রণে সব কিছু রাখার প্রবৃত্তির আরেকটি নমুনা হচ্ছে গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বয়স্ক, তরুণ, শিশু তথা সমাজের সকলের জন্য নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী অব্যাহত জীবনব্যাপী সুযোগ প্রসারিত করাই হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল প্রেরণা। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া বা বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ দানে, বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতায় ও কিশোর-তরুণদের জীবিকামুখী ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রসারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক কর্মসূচীর মূল কথাই হচ্ছে এগুলো শিক্ষার্থীর পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে স্থানীয়ভাবে সৃজনশীলতার মাধ্যমে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হবে। স্থানীয় সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও এনজিওরাই এসব কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে।

এই পথে না গিয়ে আমাদের দেশে একটি সরকারী অধিদফতর সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে সারা দেশে সরকারী কর্মসূচী হিসাবে একই রকম গৎবাঁধা কোর্স চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগ কাজ হচ্ছে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন নামে বয়স্কদের জন্য ছ'মাসের একটি সাক্ষরতা কোর্স। এই কর্মসূচীকে আন্দোলন বললেও জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে এটি চালানো হচ্ছে। বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও এনজিওদের সরকারী নির্দেশ জারি করে এই কর্মসূচীর বাইরে রাখা হয়েছে। যদিও সরকারী উদ্যোগে স্থানীয় কমিটি গঠিত হয়েছে এ জন্য। কিছুদিন পর পর শনৈঃ শনৈঃ সাক্ষরতার হার সারা দেশে বাড়ছে বলে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে এবং একেকটি জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এসব ঘোষণা ও পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতা কতখানি সে নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে এবং এভাবে ব্যবহারযোগ্য ও স্থায়ী সাক্ষরতা অর্জিত হয় না বলে অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

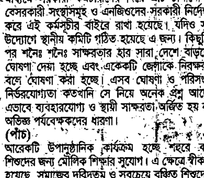

(পাঁচ)

আরেকটি উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম হচ্ছে শহরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষার সুযোগ। এ ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে, সমাজের দরিদ্রতম ও সবচেয়ে বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগদান শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সম্ভব নয়। এ জন্য যে নিবেদিত প্রচেষ্টা, সৃজনী উদ্যোগ ও প্রত্যেক এলাকায় স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্তি ও সহায়তা দরকার তা শুধু অভিজ্ঞ ও নিবেদিত বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু এনজিওদের এই কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা। অভিজ্ঞ ও দক্ষ এনজিওদের সঙ্গে এই দুরূহ কাজে সহযোগিতার সম্পর্কের পরিবর্তে ঢালাওভাবে বহুসংখ্যক এনজিওকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্যোগী হওয়ার বিশেষ সুযোগ রাখা হয়নি এনজিওদের জন্য। সরকারী নিয়মকানুন ও লালফিতার বেড়াজালে সবকিছু বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেহেতু অনেক অনভিজ্ঞ ও ভুঁইফোড় এনজিও-ও নির্বাচিত হয়েছে, সরকার থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে স্বাধীনতা না দিয়ে নিয়মকানুনের বন্ধন রাখা দরকার। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব উদ্ভূত এই সমস্যা সম্বন্ধে দাতা সংস্থাদের প্রশ্নের উত্তরে সরকারী জবাব হচ্ছে—শুধু কয়েকটি বড় ও নামকরা এনজিও নিয়ে সরকার কাজ করতে পারে না। সরকার সব এনজিও'কে সমান সুযোগ দিতে চায়। প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি সমতার ভিত্তিতে এনজিও লালনের কর্মসূচী, না কর্মজীবী শিশুর ত্রাণ এর উদ্দেশ্য। স্বভাবতই বঞ্চিত ও হতভাগ্য শিশুদের জন্য এই জরুরী শিক্ষা উদ্যোগ আশানুরূপ এগুচ্ছে না।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার এসব সমস্যার কথা ভেবে শিক্ষানীতিসংক্রান্ত প্রথম প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ব্যাপক গণশিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগে সব রকম সংগঠন ও সামাজিক উদ্যোগকে উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদানের জন্য একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হোক, বর্তমান সরকারী অধিদফতরের স্থানে দেশে সরকারী ও আন্তর্জাতিক অর্থানুকূল্যে বেসরকারী ও সামাজিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করার একটি সফল মডেল হচ্ছে পল্লী কর্মসংস্থান সহায়ক ফাউন্ডেশন। এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান গণশিক্ষা ও অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকাণ্ডে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। মন্ত্রিসভা অনুমোদিত দ্বিতীয় রিপোর্টে এই ব্যতিক্রমী প্রস্তাবের কোন উল্লেখ নেই। প্রচলিত সনাতনী চিন্তাধারা থেকে ব্যতিক্রমী বলেই হয়ত। মনে হচ্ছে সরকার গতানুগতিক উপায়ে সরকারী দফতর পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পক্ষপাতী, যদিও তা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূলনীতি ও প্রেরণার পরিপন্থী।

ড. মনজুর আহমদ ছিলেন ইউনিসেফ সদর দফতর নিউইয়র্কে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষা উপদেষ্টা। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত 'সকলের জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে পরিকল্পনা কমিটির সদস্য

(ছয়)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয়, অভিভাবক ও সচেতন নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় যে দুর্যোগ চলছে এবং এর যে সুদূরপ্রসারী বিরূপ ফলাফল, তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে না। এই নিবন্ধের পরিসর না বাড়িয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই।

কিছু ক্যাডেট কলেজ, ল্যাবরেটরি স্কুল ও বিদেশী পাঠ্যক্রমের অনুসারী ইংরেজী ভাষার স্কুলের মান মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু দেশের ৯৫ শতাংশ তরুণ যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় সেগুলোর মান অধঃপতনের চরমে পৌঁছেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতাহীন ও গণমানুষের সঙ্গে সম্পর্কবিমুখ একটি ক্ষুদ্র এলিট শ্রেণী ও বাকি সব সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বিরাট সামাজিক বিভাজনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সেটিকে ত্বরান্বিত ও মজবুত করছে।

রাজনৈতিক ও ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়ে নির্বিচারে বেসরকারী ও স্থানীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজগুলোকে সরকারের আওতায় নিয়ে আসাই যে সমস্যার সমাধান নয় তা স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে। এ পথে না গিয়ে স্থানীয় সমাজ ও স্থানীয় সরকারী-বেসরকারী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সম্পদ আহরণ ও শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টাতেই সফলভাবে ও স্থায়ীভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দফতর, প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কারিগরি ও কৌশলগত সাহায্য ও দক্ষতাবৃদ্ধির উদ্যোগ এবং সরকারী অর্থ মঞ্জুরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন হতে পারে স্থানীয় ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চেষ্টার প্রেরণাদানকারী ও সহায়ক।

(সাত)

শিক্ষার উন্নতির যে কোন আলোচনায় অর্থায়নের ব্যাপারটি এসে পড়ে। শিক্ষানীতিসংক্রান্ত প্রথম কমিটির প্রস্তাব ছিল ২০০০ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ শিক্ষার জন্য সরকারী বরাদ্দ হবে। বাস্তবে তা এখন ৩ শতাংশেরও কম। এই কমিটির প্রস্তাব অনুসারে ২০১০ সালের মধ্যে শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় হওয়া উচিত জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশে। দ্বিতীয় কমিটির প্রতিবেদন কিন্তু এ রকম স্পষ্ট কোন বক্তব্য থেকে বিরত থেকেছে। এই কমিটি "রক্ষণশীল" মনোভাব নিয়ে অনুমান করেছে যে, ২০১০ সাল নাগাদ শিক্ষা বরাদ্দ মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪.৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। কমিটির হিসাব মতে, ২০১০ সাল পর্যন্ত নতুন শিক্ষানীতি থেকে উদ্ভূত বাড়তি খরচ দাঁড়াবে ৩০ হাজার কোটি টাকা। নতুন ব্যয়ের প্রায় সবটাই নতুন ইমারত ও শ্রেণীকক্ষ তৈরি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ও সম্প্রসারণের খাতে ধরা হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ২০১০ সালে শিক্ষার সরকারী ব্যয় জাতীয় আয়ের ৪.৫ শতাংশে পৌঁছলে ৩০ হাজার কোটি টাকা অর্থ সঙ্কুলানে ১২ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়াবে। ধরে নেয়া হয়েছে যে, জাতীয় উৎপাদন বছরে গড়ে ৬ শতাংশ করে বাড়বে।

লক্ষণীয় যে, নতুন ব্যয় প্রায় সবটাই শুধু নির্মাণ ও স্থায়ী উপকরণ সরবরাহের জন্য ধরা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন শিক্ষকের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, পাঠ্য উপকরণ ও সরঞ্জামাদির পরিমাণ এবং গুণগত মান বৃদ্ধি ইত্যাদি [illegible] কোন ব্যয় দেখানো হয়নি। কমিটি কিছু না বললেও [illegible] কথা স্পষ্ট প্রথম কমিটির বক্তব্য ছিল অধিকতর বাস্তবসম্মত যদি শিক্ষানীতির লক্ষ্য হয় শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন।

মানবসম্পদনির্ভর দরিদ্র বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত তৈরি করতে হলে শিক্ষার জন্য ব্যয় বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। একই সঙ্গে বেসরকারী খাত, স্থানীয় সমাজ ও শিক্ষার সুযোগ গ্রহণকারীদের জাতীয় শিক্ষা কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পদ আহরণে ও সম্পদ ব্যবহারে শামিল হওয়ার কি ব্যবস্থা দরকার তাও ভাবতে হবে।

এ কথাও ঠিক যে, ব্যয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। যেসব মৌলিক সমস্যার কথা আগে বলা হয়েছে সেগুলোর সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে পারলেই বিনিয়োগের সুফল পাওয়া যাবে। নতুবা অপচয় ও অপহরণের দায়ই শুধু বাড়বে।

(আট)

সবশেষে বলা দরকার যে, দু'টি কমিটির প্রতিবেদনেই নীতি (Policy) এবং নীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রম (Programme) এই দুই-এর মিশ্রণ ঘটেছে। সাধারণত নীতি বলতে দিকনির্দেশনা, প্রধান লক্ষ্যসমূহ ও অগ্রাধিকার এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রক্রিয়ার কথাই মনে হয়। লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মানদণ্ডের কথাও নীতির বক্তব্যে থাকতে পারে। লক্ষ্য অর্জনের ও নীতি বাস্তবায়নের কলাকৌশল ও পদ্ধতি এবং লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি বিচারের মাপকাঠির কথাও নীতির আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। নীতি বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম সম্বন্ধে কিছু সাধারণ দিকনির্দেশনা ও দৃষ্টান্তও নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাখ্যায় সহায়ক হতে পারে। কার্যক্রমের বিবরণ নীতির বক্তব্যে থাকার কথা নয়।

নীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রম অবশ্যই হবে অনেক বিশদ ও বিস্তারিত এবং তা প্রস্তুতের কাজ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের। নীতি হবে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। কিন্তু কার্যক্রম অভিজ্ঞতার আলোকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত হবে। শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যসূচী, কোন পাঠ্যক্রমের মেয়াদ কত বছর হবে, শিক্ষক কিভাবে নিয়োজিত হবেন, পরীক্ষা কিভাবে নেয়া হবে, ছাত্রদের কখন কিভাবে প্রমোশন দেয়া হবে ইত্যাদি বিষয় নীতির প্রশ্ন নয়—নীতির ভিত্তিতে কার্যক্রম প্রস্তুতের ব্যাপার।

নীতির ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সুশীল সমাজের বিভিন্ন অংশের, সচেতন নাগরিকদের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মতানুসারীদের ঐকমত্য নিতান্ত প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও ব্যাপকভাবে সমর্থিত নীতির ভিত্তিতে শিক্ষাসংক্রান্ত আইন সংশোধন এবং নতুন আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও দিক নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পদক্ষেপ ও কার্যক্রম প্রস্তুত করতে হবে। এসব কাজই হবে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের দায়িত্ব। তবে এ ক্ষেত্রেও ব্যাপক অংশীদারিত্ব, খোলাখুলি আলোচনা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া দরকার।

পার্লামেন্টে, সুশীল সমাজে, গণমাধ্যমে ও সচেতন নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনার সময় নীতি ও কার্যক্রমের তফাত মনে রাখা দরকার। এই তফাত মনে রেখে দিকনির্দেশক বিষয়গুলো, লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের সূচক ও মাপকাঠি এবং অগ্রগতি যাচাইয়ের মানদণ্ডের দিকে নজর দিতে হবে। নীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রমসংক্রান্ত বিশদ ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তের এখতিয়ার বিশেষজ্ঞদের হওয়া উচিত; এগুলো নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত এখনই না নিলেও চলবে।

শিক্ষার বিকাশ ও উন্নয়নের পরিবেশ ও প্রেক্ষিতসংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলো নিয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাই হবে বাস্তবসম্মত শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রধান পদক্ষেপ। ঐকমত্যই যদি হয় আসল কথা, তা হলে বর্তমান যুদ্ধংদেহী রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তা সুদূরপরাহত। গণমাধ্যমে, সুশীল সমাজে ও শিক্ষাসংক্রান্ত পার্লামেন্টারি কমিটিতে ঐকমত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য আলোচনার সূত্রপাত এখন থেকেই হওয়া দরকার।

টুকরো গপ্পো

চোখের রোগ

সত্যি বলছি, তোমার রূপের প্রশংসা না করে পারছি না।
ঃ তাই তো বলি, এই চোখ তুমি এতদিন কোথায় রেখেছিলে! নিশ্চয়ই তোমার চোখের রোগ হয়েছে। চলো, ডাক্তারের কাছে যাই।

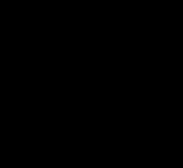

—সংগৃহীত